এটি এখন কোন সংস্কৃতি?

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্

ঘুরে ফিরে পহেলা বৈশাখ আবার আমাদের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলো। বাঙালীরা সর্বত্রই যে যার মত করে পারেন সে রকম ভাবে এই দিনটাকে স্মরণ করেন। দেশের অনেক ক'টি খবর কাগজে এক আলাদা সংকলন বের হয় এই বিশেষ দিনটিকে বরণ করার জন্যে। দেশের এখানে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও যে হয় না তেমনটি নয়। মোট কথা হচ্ছে কেন যেন হঠাৎ করে এক দিনের জন্য আমরা সবাই 'দেশী' হয়ে যাই এই দিনটাতে। কোথায় যেন পড়েছিলাম যে শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সেদিন মাটির থালায় পান্তা-ভাত আর সিদল শুঁটকি মাখিয়ে আর তা উদরপূর্তি করে এটাই প্রমাণ করতে চান যে তারাও মনে প্রাণে সত্যিই বাঙালী! বাকী ৩৬৪ দিন কি খেলাম, টেলিভিসনে কোন কোন হিন্দী সোপ-ওপেরা দেখলাম, ডিভিডিতে কি বলিউডী ছায়াছবি দেখলাম তার ফিরিস্তি আর নাই বা দিলাম! হোক না? একদিনের জন্য বাঙালী হওয়া — এটা কি চাট্টিখানি কথা নাকি?

আমাদের দেশী সংস্কৃতিতে বিদেশী ভাবটি এত মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো কি ভাবে? গত ত্রিশ বছরে আমাদের ধ্যান-ধারণা এ'সব এত পাল্টে গেল কি করে? এটি কোন আকাদেমিক বা 'র‍্যাটোরিক্যাল' প্রশ্ন নয় যে এর উত্তর না দিলেও তাতে কিছু আসবে যাবে না। বিদেশে অবস্থানরত বাঙালীদের মধ্যে হাতে গোনা এমন ক'জনা আছেন যারা বাঙলার সংস্কৃতিতে অপ-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ হবার কারণে চিন্তিত। তাঁরা যে এই ব্যাপার নিয়ে সোল্লাসে লেখাজোখা করেন না — তা নয়, তবে তা খুবই সীমিত । যেহেতু আমরা এই সংকলনের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করতে প্রয়াসী হয়েছি, সেহেতু বাঙালী সংস্কৃতির এই নিদারুন অবস্থা নিয়ে দু'চার কথা যে লিখব না এমনটি তো হতে পারে না। যদি এ'ব্যাপারটি নিয়ে মাত্রাধিক কিছু লিখে ফেলি তা'হলে নিজগুনে তা ক্ষমা করে দেবেন সেটি আশা করছি।

আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব যে অনেক আগে থেকেই পড়ে এসেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে কি? মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেই ১৮৪৯ সনে 'দ্যা কেপ্‌টিভ লেইডী' নামে এক সুদীর্ঘ ইংরেজী কবিতা বা কাব্য রচনা প্রকাশিত করেছিলেন যখন তিনি মাদ্রাসে কোন এক স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষকতা করতেন। এই কাব্য পড়লে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে দত্ত কবি জন কীট্‌স এর কবিতা পড়ে ভীষন ভাবে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ইংরেজীতে কাব্য রচনা করার। পরে অবশ্য দত্ত কবি যখন বুঝলেন যে তাঁকে তা'র মাতৃভাষাতেই লিখতে হবে, তখন তিনি তাঁর বাঙলা মহাকাব্যগুলো 'ফ্রী-ভার্স' বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ করেন। বাঙলায় প্রথম বারের মত সনেটের অনুপ্রবেশ যে ঘটে আর তা সাহিত্য জগতে অতি সহজে যে সমারূঢ় হয় তাও দত্ত কবির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়! দত্ত কবি ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, প্রমুখ কবিরা বাঙলা সাহিত্যে এক দারুণ প্রভঞ্জন নিয়ে এলেন; এর দ্বারা প্রচুর সমৃদ্বিশালী হলো বাঙলার সাহিত্য। তখন থেকেই জন্ম নিল 'স্যাকুলার' বা সার্বজনীন সাহিত্যের। এর আগে সাহিত্যের মূল বিষয় বস্তু ছিল হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীমালা। বঙ্কিম চাটুজ্জে পাশ্চাত্যের অনুকরণে সামাজিক ও ঐতিহাসিক 'নভেলা' বা ছোট উপন্যাস লিখে আমাদের সাহিত্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। এঁর লেখা ছাড়া বাঙলায় শরৎ চাটুজ্জে আগমন ঘটতো কি না কে জানে? অতএব, বিচার করলে দেখা যাবে যে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বাঙলা সাহিত্যে পাশ্চাত্যের যে ছোঁয়া পড়েছিল তা আমাদের সাহিত্যকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছিল নিঃসন্দেহে — তা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।

কালের চাকা দেড়শ বছর এগিয়ে দিলে আমরা উপনীত হবো বর্তমান সময়ে। জীবন জটিলময় হবার

দরুন এখন আর কেউ আগের মত সময় করে ক্লাসিক উপন্যাস, কাব্য, এ'সব তেমন কেউ আর পড়েন না। এ'দিকে দত্ত কবির মহাকাব্যগুলো বাঙলা ডিপার্টমেন্টে গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের নভেলগুলো কেউ আর তেমন পড়েন কি? আর বঙ্কিমের লেখাগুলোকে বাঙ্লাদেশের সুধীসমাজরা অবজ্ঞা করেন এই বলে যে তিনি না কি 'কমিউনাল' বা সাম্প্রদায়িক লেখক ছিলেন। আমি বিদীর্ণ হৃদয় নিয়ে নয়া করে আবার তাঁর 'আনন্দমঠ' নভেলাটি পড়লাম এই সে'দিন; সতেরশ শতাব্দীতে বাঙলার গ্রামে যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়েছিল তার পটভূমিকায় রচিত এই নভেলাটি। সন্ন্যাসীরা কালীমাতার ভক্ত হবার দরুন ''বন্দে মাতারম্'' গানটি গাইত শক্তি উপার্জন করার নিমিত্তে। গানের এ'কথাটির মানে উপলব্ধি না করেই অনেক মুসলিম ''পন্ডিতরা'' এই রায় দিলেন যে বঙ্কিম চাটুজ্জে না কি যারপরনাই সাম্প্রদায়িকতায় ভুগতেন। এ'সব মহাজ্ঞানী বাঙলার দিগ্গজ মুসলিম ''পন্ডিতরা'' যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য কলেজে বাঙলায় মাস্টার ছিলেন তারা উনিশ শ পঞ্চাশ ষাট সনে এই বলে ফাঁতোয়া দিলেন যে বঙ্কিম চাটুজ্জের রচনাসমূহ আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়া সমীচীন নয়!

গত কুড়ি-পচিশ বছর যাবৎ ওহাবী মুলমন্ত্রের কৃপায় আমাদের মাতৃভূমিটা পরিনত হয়েছে একটা মিনি-তালেবান দেশে। সে'কারণে দেশের সাহিত্যে এসলামী ভাব এসে এমন ভাবে পড়েছে যে বাংলা পত্র-পত্রিকায় এসলামী কবিতার ছড়াছড়ি পড়ে গেছে। দয়া করে নিউ ইয়র্ক হতে প্রকাশিত 'ঠিকানা' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি খুলুন, দেখবেন সেখানে এসলামী কবিতার বহর খানি কদ্দুর।

এরি মধ্যে বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত মা-বোনদের অনেকে শাড়ী বাদ দিয়ে মধ্য-প্রাচ্য থেকে আমদানীকৃত সংস্কৃতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে 'হিজাব' ধরেছেন। দেশে এখন তবলীগী জামাতের ভরা মৌসুম চলছে। তাই আপামর বাঙালীরা ভারত হতে আমদানীকৃত 'দেওবন্দী' ইসলামে দীক্ষিত হয়ে প্রতি বছর শীতে টংগীর তুরাগ নদীর পারে বিশ্ব-ইজ্তেমায় ভীড় জমাচ্ছেন 'আখেরী মুনাজাত' এ যোগ দিতে। দেশে ৯-১১ পর এসলামী ভাবখানা আরো জোরালো হয়েছে। গ্রাম বাঙ্লার আনাচে-কানাচে দেখা দিয়েছে তালেবানী সংস্কৃতির যারপরনাই এক প্রভাব। বাঙলা ভাই, শেখ-উল হাদিস, খাতিব, মুফতি এ'সব দ্বারা ভরে গেছে দেশটি যেখানে এক সময় শীতের মরসুমে ভরে যেত প্যান্ডেল যাত্রাগান, কবিগান, পালাগান, এ'সবের দ্বারা। বিলক্ষণ, আজকাল নাকি যাত্রার মঞ্চে গ্রানেড ছোড়া হয় যাতে করে এই দেশ থেকে দেশীজ সংস্কৃতি চিরতরে বিদায় নেয়!

আজকাল আবার 'বিশ্ব আয়ন' এর খপ্পরে পড়ে দেশের অসমূহ অর্বাচীন ছেলেমেয়ের দল (বিশেষত শহুরেরা) পশ্চিমী সংগীতের এতই ভক্ত হয়ে পড়েছে যে তারা নজরুল-রবীন্দ্র-ডি এল রায়ের গান ছেড়ে রক-ফিউশন গানের 'কনফিউশন' এ পড়ে গেছে। মার্চের ১৪ তারিখ (২০০৫) এর 'ডেইলী স্টার' পত্রিকার পাতায় এক খবর পড়ে আমার তো চক্ষু চড়ক গাছ! ঢাকার অনতিদূরে মীরপুরে ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে নাকি চল্লিশ হাজার অর্বাচীন জমা হয়েছে ''এম্প-ফেস্ট' নামে এক রক-কনসার্টে। সেখানে হেলিকপ্টার যোগে পাকিস্তানী রক-গ্রুপ 'জুনুন' এসে নেবে তারপর গান শুরু করেছে। এসব নিয়ে মহা হৈ হৈ কান্ড অন্ততঃ খবরের শীরনামে! এ'সব পাশ্চাত্যের কালচারের ঢেউ এর ঠেলায় আমাদের দেশীজ গান যেমন রাগ-প্রধান বাঙলা গান, টপ্পা, ঠুম্রী-খেয়াল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, আরো অন্যান্য গান বানের জলে ভেসে যাচ্ছে বা যাবার উপক্রম হয়েছে। এ'নিয়ে অবশ্য দেশে কারু মাথা ব্যথার কারণ নেই!

দেশীজ সংস্কৃতির এই দুরাবস্থা দেখে মনে হয় আমি কি সেই দেশে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে যাব যেখানে বাঙ্লার আদি ও অকৃত্তিম সংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে? ভাবতেই মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে যে আর অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্লার বক্ষে আমাদের হাজার বছরের গড়া সংস্কৃতির বুনিয়াদ গুলো একে একে ধ্বসে পড়বে। আর তার মাঝ থেকে জন্ম নেবে এক নয়া ''গ্লোবাল' কালচার যার বুনিয়াদ হবে বলিউড-হলিউড

থেকে তৈরী সিনেমার দেয়া 'ভ্যালু' বা উপকরণ । আর অন্য একটা সংস্কৃতি ও ভূঁই-ফোড়ে বের হচ্ছে যা হচ্ছে ''তালেবানী তমুদ্দুন''। ভাব গতিকে মনে হচ্ছে কিছু দিনের মধ্যেই সারা দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলোতে বলিউড-ভিত্তিক ''গ্লোবাল'' কালচারের জয় হবে। তবে এখন আমাদের দেশে কালচারের নামে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তাতে করে নয়া এক সঙ্কর বা দোআঁশলা সংস্কৃতির জন্ম এরি মধ্যে হয়ে গেছে। এটি আমার পছন্দ কি অপছন্দ তাতে কিছু যায় আসে না — তবে কালের আবর্তে আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তার 'অবিচুয়ারী' নোট এখনই সুস্পষ্ট ভাবে পড়তে পারছি মনের দেয়ালে সাঁটা এক বহুবর্ণের সমাহারে লেখা এক বিজ্ঞাপনে। বিদগ্ধ পাঠকসমাজ, এই ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি?

স্লাইডেল, লুইজিয়ানা